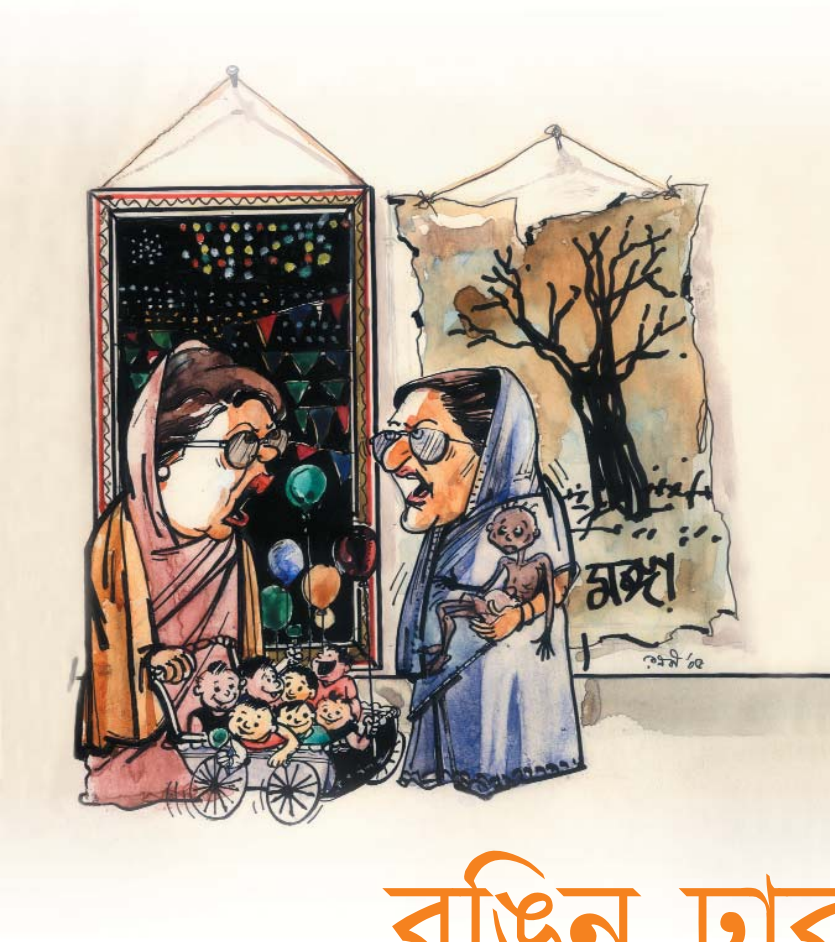

রঙিন ঢাকা, মঙ্গা... খালেদা-হাসিনার রাজনীতি

অনিরুদ্ধ ইসলাম

রেড এলার্ট আর অরেঞ্জ এলার্ট- এ দুটি বিপদ বা নিরাপত্তা সংকেতের নামে দেশবাসী গত ক'দিন ধরে চোখে সর্ষে ফুল অর্থাৎ ইয়োলো এলার্ট দেখেছেন। দেশে যখন মঙ্গা, দ্রব্যের অগ্নিমূল্য, নানা অভিযোগে জর্জরিত- তখন বাংলাদেশ সরকার আয়োজন করলো সার্ক সম্মেলন। জীর্ণশীর্ণ ঢাকা পেল রঙিন চেহারা। চোখ বন্ধ করে লজ্জা ঢাকার কি নির্মম প্রয়াস!

অনেকে প্রশ্ন করেছেন সার্ক সম্মেলন না করলে কী হতো? আমরা বলতে চাই সার্ক সম্মেলন করাটা অন্যায় নয়, করার হয়তো প্রয়োজনও আছে। কিন্তু লোক-দেখানোর জন্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের বাস্তবে অবস্থা যেমন, আমাদের যেমন সাধ্য আছে সেভাবেই করতে হবে। আমরা অবশ্যই এটা বিশ্বাস করি যে, সেভাবে করা সম্ভব ছিল। নিরাপত্তার নামে যে তামাশা করা হয়েছে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য যেমন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়, সার্ক নেতাদের জন্য তেমন নিরাপত্তাই যথেষ্ট ছিল। সিঙ্গাপুর থেকে ৭ লাখ টাকার ফুল কিনে আনার মতো আহম্মকি আচরণের প্রয়োজন ছিল না। মনে রাখতে হবে এই টাকা আমরা লোন করে এনেছি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এডিবির কাছ থেকে। প্রশ্ন আসে, ঋণের টাকা নিয়ে এমন রাজকীয় আচরণের অর্থ কী? অর্থ একটাই- রাজনীতি।

সার্ককে কেন্দ্র করে আমাদের দুই নেত্রী রাজনীতির খেলায় মেতে উঠেছিলেন। খালেদা জিয়া চাইছিলেন যে কোনো উপায়ে সার্ক সম্মেলন আয়োজন করতে। লাভ দুটো, ব্যক্তি খালেদা জিয়া নেতা হিসেবে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আলোচনায় আসবেন। আর জোট সরকার এত বড় একটি সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করতে পেরেছে এতে দেশবাসী অবিভূত হবে। আগামী নির্বাচনে এর একটা প্রভাব পড়বে।

শেখ হাসিনা চাইছিলেন বাংলাদেশ যেন কোনোভাবেই সার্ক সম্মেলন আয়োজন করতে না পারে। এতে খালেদা জিয়া এবং জোট সরকারকে বন্ধুহীন হিসেবে প্রমাণ করা যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন খালেদা জিয়াই। সার্ক সম্মেলন আয়োজন করে দেশের কোনো লাভ না হলেও লাভবান হয়েছেন খালেদা জিয়া।

সার্ক সম্মেলনের সময় শেখ হাসিনা রাজনীতির জন্য বেছে নিয়েছিলেন মঙ্গাপীড়িত অঞ্চল। কিন্তু তার এই রাজনীতি জনমনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি যা বলেছেন জনগণ তা বিশ্বাস করেনি। কারণ তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনও উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ছিল। তখন শেখ হাসিনা মঙ্গা দূর করার জন্য কিছুই করেননি।

এখন ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্নে বিবর্তিত হচ্ছে রাজনীতি। সেই লক্ষ্যে খালেদা জিয়া আয়োজন করলেন সার্ক। শেখ হাসিনা আয়োজন করবেন মহাসমাবেশ। খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থেকে যেতে চান। শেখ হাসিনা এখনই সরকারের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতায় যেতে চান।

এই মহাসমাবেশ সম্পর্কে বিরোধী দলের উদ্যোক্তারা বলছেন, এখান থেকেই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পতনের চূড়ান্ত কর্মসূচি আসবে। মহাসমাবেশের আয়োজক চৌদ্দ দলের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বলেছেন, 'এই মহাসমাবেশ হবে সরকারবিরোধী আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট।' অবশ্য আবদুল জলিল জোট সরকারের কাছে তার দলের আন্দোলনের এক

পর্যায়ে ৩০ এপ্রিলকে সরকার পতনের সময়কাল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তার ঐ ঘোষণা টেলিভিশন ও পত্রিকার 'টক আইটেম' হয়েই থেকেছে। বাস্তবে সরকার পতন দূরে থাক সরকার পতনের আন্দোলনেরও কোনো দেখা পাওয়া যায়নি সে সময়। এর জন্য আবদুল জলিলকে দল ও দলের বাইরে থেকে বহু সমালোচনা শুনতে হয়েছে। কিন্তু দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেছেন এবং তাকে আন্দোলনের ঐক্য গড়ে তোলার বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করেন। অবশ্য তিনি তার সঙ্গে দলের সভাপতিমন্ডলীর চারজন সদস্য- আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে যুক্ত করে দিয়েছেন। আবদুল জলিলের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সভাপতিমন্ডলীর এই পাঁচজন মিলে বিরোধী দলের আন্দোলনে একটি ঐক্যবিধান করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা, এএমএস কিবরিয়ার হত্যাকান্ড ও সর্বশেষ ১৭ আগস্টের ইসলামী জঙ্গিদের সিরিজ বোমা হামলা এই ঐক্যবিধানের কাজকে সহজ করেছে। বলতে এই ঐক্যেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে ২২ নবেম্বরের মহাসমাবেশে। ২২ নবেম্বরের এই মহাসমাবেশ থেকেই আন্দোলনকারী বিরোধীদলসমূহ, আওয়ামী লীগ, এগারো দল, জাসদ ও ন্যাপ জাতির সামনে ন্যূনতম কর্মসূচি ও আন্দোলনের পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করবে।

মহাসমাবেশ থেকে বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধতার যে প্রকাশ ঘটবে তার চেহারাটা কি তা নিয়ে সংবাদপত্রে ও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। তবে এ পর্যন্ত ঐ ঐক্য আওয়ামী লীগ, এগারো দল, জাসদ ও ন্যাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সাবেক বিএনপি নেতা ও রাষ্ট্রপতি ডা. বি চৌধুরীর বিকল্পধারা অবশ্য বলেছে তারা আমন্ত্রণ পেলে ২২ নবেম্বরের প্লাটফর্মে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু এসব দলের মধ্যে বা লিয়াজোঁ কমিটিতে সে ধরনের কোনো আলোচনা হয়নি। আর দলগুলোও সে ব্যাপারে তাদের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বিরোধী দলের লিয়াজোঁ কমিটির সূত্রে প্রকাশ, বিকল্পধারা সম্প্রতি এই ঐক্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেও রাজনৈতিকভাবে তারা নিজেদের আলাদা অবস্থানে রাখার পক্ষপাতী। রাজনীতিতে বিকল্পধারার মূল জায়গাটি বিএনপির রাজনৈতিক ধারাই। সে কারণে আওয়ামী লীগ ও বামদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তারা বিএনপিপন্থিদের নিজের কাছে টানার সুযোগ তারা হারাতে রাজি নয়। বস্তুত, বিকল্পধারা যে নির্বাচনী ছক এঁকেছে তাতে তারা বিএনপি'র বিদ্রোহীদের সমবেত করতে চায়। বিএনপি'র বিদ্রোহী বা কক্ষচ্যুত এমপি, এমপি

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার ঘনিষ্ঠজনদের বলেছেন বিএনপি-জামায়াত জোটকে আইনি বৈধতা দেয়ার জন্য তিনি নির্বাচন করবেন না। চৌদ্দ দলের জাসদ এ ব্যাপারে বেশ দৃঢ় এবং ঐ সমাবেশ থেকে একটা দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করার পক্ষপাতী। সেই ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার পরপরই সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে

প্রার্থীরা বিকল্পধারাকে তাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে রেখেছেন। আওয়ামী লীগও চায়, বিকল্পধারা বেশি সংখ্যক বিএনপিপন্থিদের তাদের পক্ষে টানুক। সুতরাং এখনই এক প্লাটফর্ম তাদের নিতে তারা বিশেষ আগ্রহী নয়। অন্যদিকে এই ঐক্যের অন্যান্য দলগুলো একমাত্র ড. কামালের গণফোরাম ছাড়া বিশেষ কেউ বিকল্পধারার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এর মাঝে এগারো দলের যখন কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় ছিল তখন তারা বিকল্পধারার ব্যাপারে সুস্পষ্ট আপত্তি উত্থাপন করেছে। এখনো সাম্যবাদী দল বিকল্পধারার ব্যাপারে তাদের আপত্তিতে সোচ্চার। অন্যান্য বামদলগুলো মনে করে যে, স্ব স্ব অবস্থান থেকে বর্তমান আন্দোলনের যে ঐক্য গড়ে উঠেছে সেখানে বিকল্পধারা অবস্থান নিলে অসুবিধা নেই।

তবে এ দলগুলো সবাই এরশাদকে বিরোধী দলের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ বিরোধী। তারা এরশাদকে আন্দোলনের কোনো শক্তি বলে মনে করে না। বরং বিরোধী দলের আন্দোলনে এরশাদের অন্তর্ভুক্তি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পথ প্রশস্ত করতে পারে বলে তারা মনে করেন। বিশেষ করে রওশন-বিদিশাও দুর্নীতি মামলা নিয়ে এরশাদের ওপর জোট যে চাপ অব্যাহত রেখেছে তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার আগ পর্যন্ত এরশাদবিরোধী কোনো রাজনৈতিক অবস্থান নিতে পারবে না বলে তারা মনে করেন। সে ক্ষেত্রে বিরোধী আন্দোলনে এরশাদের অন্তর্ভুক্তি 'লায়াবিলিটি' হয়ে দাঁড়াবে বলেই তাদের বিশ্বাস।

অপরদিকে এরশাদও আওয়ামী লীগসহ বিরোধী আন্দোলনের কাতারে শামিল হতে আগ্রহী নন। তার ধারণা যে, জনগণ দুই মহিলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপারে খুবই বিরক্ত। তারা এর পরিবর্তন চায়। আর সে ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র বিকল্প। তার মতে, নির্বাচকমন্ডলীর যে মনোভাব তাতে জাতীয় পার্টি জাতীয় সংসদে ভালোসংখ্যক আসন পাবে এবং তাদের বাদ দিয়ে কেউ সরকার গঠন করতে পারবে না। অন্যদিকে চৌদ্দ দলের আওয়ামী লীগ ছাড়া এরশাদ কাউকে দল বলে মনে করেন না। ২০০০-কে দেয়া সাক্ষাৎকারে এরশাদ খোলাখুলিই বলেছেন যে, চৌদ্দ দলের ২৮ জন লোক নেই। সুতরাং নির্বাচনের হিসাবে তিনি তাদের ধরেন না। অন্য কাউকে নিয়ে নির্বাচনী জোট করার ব্যাপারে এরশাদ আগ্রহী নন। কারণ অন্য দলগুলোকে জোটে নিতে গেলে তাকেই তাদের টানতে হবে। তাদের নির্বাচনী খরচও তাকেই দিতে হবে। এই অবস্থায় এরশাদের বিরোধী দলের আন্দোলনে যোগ দেয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

অন্যদিকে জাকের পার্টিকে ইসলামীপন্থি কিছু কিছু দল বিরোধী দলের মূল স্রোতের থাকে সংশ্লিষ্ট হতে চাইছে। জানা গেছে, আওয়ামী লীগ, বিশেষ করে শেখ হাসিনার তরফ থেকে ইসলামপন্থি এই দলগুলোকে পক্ষে রাখার একটা চেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে সে ব্যাপারে বড় ধরনের কোনো সাফল্য আসেনি। ইসলামপন্থি দলগুলোর মধ্যে অন্যতম চরমোনাইয়ের পীর সাহেবের 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' জামায়াতের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ তাদের দেখা যায়নি এখন পর্যন্ত।

এসব মিলিয়ে ২২ নবেম্বরের মহাসমাবেশ থেকে 'মহাঐক্য'-এর ঘোষণা আসতে পারে বলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে দাবি মাঝে মাঝে করা হয় তার বাস্তব কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।

বিরোধী আন্দোলনের মহাজোট না হলেও বিরোধী এই ঐক্য নির্বাচনী মহাঐক্যে রূপ নেবে কি না। চৌদ্দ দলের ঘনিষ্ঠরা জানাচ্ছেন যে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের যাত্রারম্ভের সময় 'একত্রে আন্দোলন, একত্রে নির্বাচন, একত্রে সরকার'- বিরোধীদলগুলোর প্রতি এ ধরনের আহ্বান জানানো হলেও, আন্দোলনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হলেও ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বিশেষ আলোচনা হয়নি। জানা যায়, মুখ্য দল হিসাবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। গত পনেরো

২২ নবেম্বর মহাসমাবেশ

জাতীয় রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট

খোন্দকার তাজউদ্দিন

ঈদের ছুটি শেষে কর্মস্থল ঢাকায় ফিরছি। পাশের সিটে বসা ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রী দিলারা হোসেন। সাংবাদিক পরিচয় জেনে রাজনীতির বিষয়ে বেশ আলাপ জমালেন। বললেন, উভয় নেত্রীর ব্যর্থতার কথা। দেশে ভয়াবহ উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, তীব্র বিদ্যুৎ ও পানি সংকট, বিনা বিচারে মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, বিশেষ ভবনের দাপটে সবকিছু তছনছ, সন্ত্রাস- সব কিছু মিলিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ। এক পর্যায়ে দিলারা হোসেন জানতে চাইলেন আগামী ২২ নবেম্বর বিরোধী দল মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে। এটা কি দেশে রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট কি না? আগামীতে সত্যিই কী দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে?

আগামী ২২ নবেম্বরের সমাবেশ যাতে সফল হয় তার সকল ছক পূরণ করা হয়েছে। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে লোক সমাগম ঘটিয়ে ১০-১৫ লাখ লোকের মিলনমেলা তৈরি করতে। এই লোক সমাগম একদিকে বিরোধী দলকে উজ্জীবিত করবে, অপরদিকে সরকারের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

২২ নবেম্বর মহাসমাবেশের আগে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী ১২টি জেলায় সমাবেশ করা হবে। জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করা হবে। আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগ ৫০ হাজার, যুবলীগ ৫০ হাজার, ছাত্রলীগ ৫০ হাজার, স্বেচ্ছাসেবক লীগকে ৪০ হাজার লোক সমাগম করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ঢাকার প্রবেশপথের থানা থেকে সর্বাধিক লোক উঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। টঙ্গীর জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, সাভারের মুরাদ জং, কেরানীগঞ্জের নজরুল হামিদ বিপু, সোনার গাঁয়ের কায়সার হাসনাত তাদের প্রত্যেক থানা থেকে ৫০ হাজার করে লোক উঠানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা থানা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে বৈঠক সম্পন্ন করেছে। ঢাকার প্রবেশ দ্বারের এই চার থানা থেকে প্রায় দুই লাখ লোকের সমাগম ঘটানো হবে।

দেশের প্রায় সকল প্রান্ত থেকে আন্দোলনের চূড়ান্ত কর্মসূচির জন্য চাপ আসছিল। এসব বিবেচনায় এনেই ১৪ দল নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া শেষে চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণার দিনক্ষণ ঠিক করেছে। ১৪ দলের ঘোষিত কর্মসূচি ইতিমধ্যে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। সবাই জানতে চায় কী হবে, কী কর্মসূচি দেয়া হবে? এবার আন্দোলন সত্যিই গতিশীল হবে কি না, চূড়ান্ত রূপ পাবে কি না?

১৪ দল লোক সমাগম ঘটাবে ঢাকা জেলা, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা (উত্তর), কুমিল্লা (দক্ষিণ), চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, গাজীপুরসহ দেশের অন্যান্য জেলা থেকে।

২২ নবেম্বরের সমাবেশ থেকে যে কর্মসূচি আসতে পারে তাহলো (১) উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদ ঠেকাতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা, সকল গ্রেনেড ও বোমা হামলার বিচার করা ২. সন্ত্রাসী, গডফাদারদের চিহ্নিত করে রাজনৈতিক দল থেকে বহিষ্কার করা এবং সুস্থধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা ৩. দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করা ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ৪. বন্ধ কলকারখানা চালু করা ৫. কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার করা। উন্নতি করা ৬. পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করা, আদিবাসী সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ৭. তেল, গ্যাস বন্দরের জাতীয় স্বার্থে পরিকল্পিত সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

এছাড়া ৭টি নতুন দাবি যুক্ত হতে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করা ২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, সকল বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও বিচার করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকল কালাকানুন বাতিল করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ৩. মন্ত্রী ও এমপিদের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রশাসনের ক্ষমতায়ন। ৪. সংবিধান অনুযায়ী একমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বাণিজ্যকরণ বন্ধের পাশাপাশি বিশ্বমান নিশ্চিত করা। ৫. জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় পর্যায়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ৬. সংবাদপত্র, রেডিও, টিভিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ও স্বায়ত্তশাসন দেয়া। আকাশ-সংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করা। ৭. নদী-বিদ্যুৎ-পানি ব্যবস্থাপনায় বৈষম্য হ্রাস করা, চোরাচালান এবং আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। সকল অসম বাণিজ্য ও সামরিক চুক্তি বাতিল করা।

এসব দাবি পূরণ করার জন্য আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক মাস সময় বেঁধে দেয়া হবে। এর মধ্যে সরকারকে পদত্যাগ করার জন্য আল্টিমেটাম দেয়া হবে। সেটা না মানলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ঢাকা ঘেরাও, অবরোধ, বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে জনতার মঞ্চ, লাগাতার হরতাল, পদযাত্রা, রেলযাত্রা, সংসদ থেকে পদত্যাগ, সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা ইত্যাদি।

এসব দাবি মেনে নেয়ার জন্য কৌশলগত মহা ঐক্যজোট গঠন করা হবে। এ জোট হবে আন্দোলনের নির্বাচনের এবং সরকার গঠনের। সরকার যদি দমন-পীড়ন করে এই মহাসমাবেশ বন্ধ করার চেষ্টা করে তা হলে দেশের রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন আসতে পারে।

বিরোধী দলের ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের কড়া নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। সমাবেশের আগে থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে যাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ আছে তাদের গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে মহাসমাবেশে যোগ দিতে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

দেশের জনগণ স্বচ্ছ নির্বাচন চায়। এর জন্য প্রয়োজন সংস্কার। এ দাবি অস্বীকার করে বিরোধী দলবিহীন নির্বাচনে গেলে, বিএনপি আরো একটি ভোটারবিহীন ১৫ ফেব্রুয়ারির জন্ম দেবে। দেশে-বিদেশে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। তা ছাড়া বিএনপি ভোটারবিহীন নির্বাচন করেও পার পাবে না।

সে ক্ষেত্রে বিএনপির উচিত হবে সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরি করা। তাদের মনে রাখা উচিত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তারাও বিরোধী দলের কাতারে চলে আসবে। সহানুভূতি পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ লতিফুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও এমএ সাঈদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বানিয়েছিল- ফল হয়েছে উল্টো। নির্বাচনী খেলায় দলীয় রেফারির চেয়ে নিরপেক্ষ রেফারিই সবার প্রয়োজন।

জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারও নির্বাচনী সংস্কারের অভিন্ন প্রস্তাব পেশ করার পর দীর্ঘদিন দেশের বাইরে কাটিয়ে ফিরেই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ী ও পরাজিত সকল প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়া শুরু করেন। এর ফলে ধারণা সৃষ্টি হয়, তিনি প্রার্থী বাছাই শুরু করেছেন। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যেও বেশ শোরগোল শুরু হয়ে যায়। নির্বাচনের প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ঐ সাক্ষাৎ শেষে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে আগামী নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যাপারে সভানেত্রী তাদের 'ক্লিয়ারেন্স' দিয়েছেন বলে প্রচার শুরু করেন। তার বিরোধিতায়ও প্রচার শুরু হয়। নির্বাচনের ব্যাপারে শেখ হাসিনার এই পদক্ষেপ বিরোধী আন্দোলনের অন্যান্য দলগুলোর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারণ একদিকে নির্বাচনী সংস্কারের ব্যাপারে বিরোধী দলের শক্ত অবস্থান ও অন্যদিকে আওয়ামী লীগ

সভানেত্রীর প্রার্থী বাছাই খুব স্বাভাবিকভাবে অন্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারণ তাদের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার ব্যাপারে কোনো আলাপ ছাড়াই এ ধরনের প্রার্থী বাছাই সমস্যার সৃষ্টি করবে বলে তাদের ধারণা। বিশেষ করে কেউ একবার নির্বাচনী মাঠে নেমে গেলে আর উঠে আসবেন না। এটা বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ব্যাপারে সত্য। নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ কারো সঙ্গে সমঝোতাও করে তবে ঐসব প্রার্থী রয়ে যাবেন বলে তাদের আশঙ্কা। আওয়ামী লীগ অবশ্য বিরোধী দলসমূহের এই আশঙ্কা দূর করছে এই বলে যে, নির্বাচনের দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে প্রস্তুত থাকতেই হবে। তাছাড়া এ ধরনের সাক্ষাৎকার প্রার্থিতা বাছাই নয়, বরং এলাকায় যাতে কাজের গতি বাড়ে তারই একটি পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক আলাপ বা সমঝোতা না হলেও আওয়ামী লীগ অন্যান্য দলগুলোর জন্য ১০০ আসন ছেড়ে দেয়ার প্রস্তুতি রেখেছে। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী যে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করেছেন, যারা বর্তমানে এমপি আছেন, গত তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে সব আসনে জিতে আসছে এবং গত নির্বাচনে পরাজিত আসনসমূহের যেসব আসনে পার্থক্য কম সেসব আসন বাদে অন্যগুলো বিরোধী অন্য দলগুলোর জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। সেই হিসেবে আওয়ামী লীগ ১৭৫টি আসন নিজেদের জন্য বাছাই করেছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেসব আসনে অন্য বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা জিততে পারেন সেসব আসনেই প্রার্থী তাদের দেয়া উচিত বলে আওয়ামী লীগ মনে করে।

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কলকাতার দি স্টেটসম্যান বাংলা সংস্করণে সে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন সেখানে এ ব্যাপারে তার মন্তব্য নিয়ে এসব বিরোধী দলের মধ্যে বেশ কিছুটা উষ্মার সৃষ্টি করে। তারা বলেন, অন্যান্য বিরোধী দলের কে কোথায় নির্বাচন করবে, তা তাদের নিজেদের ব্যাপার। আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সে বিষয়ে বলার কিছু নেই।

চৌদ্দ দলের অন্যতম দল ওয়ার্কার্স পার্টি তার নির্বাচনী সিদ্ধান্তে বলেছে, দলটি তাদের প্রতীক নিয়ে নিজেদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ও কৌশলে নির্বাচন করবে। এ ক্ষেত্রে তারা আসন সমঝোতা করবে। তবে এ আসন সমঝোতার বিষয়টি এখনো আলোচনা হয়নি। ওয়ার্কার্স পার্টি মনে করে, নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করেই মূলত নির্বাচন করতে হবে।

চৌদ্দ দলের অন্যান্য দলের অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার অবস্থান নেই। তবে গণফোরাম 'বিকল্পধারা'কে সঙ্গে নিয়ে আসন সমঝোতার ব্যাপারে বেশ দরকষাকষি করবে। জাসদ নির্বাচনের ব্যাপারে পুরোপুরিই আওয়ামী লীগের ওপর নির্ভরশীল। জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু প্রথম থেকেই 'ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন ও ঐক্যবদ্ধ সরকার' এই তত্ত্ব ফেরি করে বেড়াচ্ছেন।

তবে নির্বাচনের সমাঝোতা বা জোটের ব্যাপারে চৌদ্দ দলের দলগুলোর বাইরে বিকল্প ধারাও এরশাদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ

মহাসমাবেশ ঘিরে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য

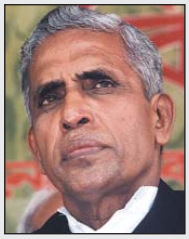

২২ নবেম্বরের মহাসমাবেশ দেশের রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট। আন্দোলনের যাত্রা এর মাধ্যমে শুরু হবে। যে আন্দোলন খালেদা-নিজামী সরকারের দুঃশাসনের হাত থেকে জাতিকে মুক্তি দেবে। এ সমাবেশে আন্দোলনের তিনটি স্তরের এজেন্ডা প্রকাশিত হবে। ১. সরকার পতনের আন্দোলন ২. নির্বাচনী জোট ৩. জোটের পরে ক্ষমতার প্রশ্ন কীভাবে সরকার গঠন করা হবে।

আব্দুর রাজ্জাক এমপি
প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

দেশের ভয়াবহ মঙ্গা, সন্ত্রাস, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিসহ সার্বিক অবস্থায় দেশের মানুষ একটি গুণগত পরিবর্তন চায়। এ পরিবর্তন অর্থবহ হতে হবে। আগামী ২২ নবেম্বর দেশের মানুষের অর্থবহ পরিবর্তনের মুক্তির জন্য কর্মসূচি ঘোষিত হবে। দেশের মানুষকে মুক্ত করার এ যুদ্ধ আমার জীবনের শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে।

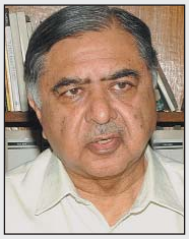

ডঃ কামাল হোসেন
সভাপতি, জাতীয় ঐক্যমঞ্চ ও গণফোরাম

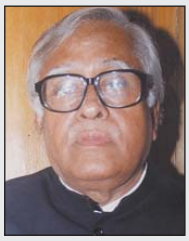

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা হয়। এটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী কাজ নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশোধনী ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবি আজ শুধু আওয়ামী লীগের দাবি নয়- এটা সকল বিরোধী দলের, গণমানুষের। আগামী ২২ নবেম্বর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমাবেশ থেকে দেশে অর্থবহ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নতুন আন্দোলনের ঘোষণা আসবে। এ আন্দোলন হবে স্বৈরাচার বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের। এ যুদ্ধে বিজয়ের কোনো বিকল্প নেই।

আব্দুল জলিল এমপি
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের হঠকারী রাজনীতি পরিহার করতে হবে। ২২ নবেম্বর ১৪ দল যদি ১০ লাখ আনে তবে বিএনপি'র মহাসমাবেশে ২৫ লাখ লোক আনা হবে। মহাসমাবেশের হুমকি-ধামকি দিয়ে লাভ নেই। মহাসমাবেশ করলেই কোনো সরকারের পতন হয় না।

আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া এমপি
মহাসচিব বিএনপি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

পল্টন ময়দানে বিরোধীদলীয় নেত্রী কি ঘোষণা দেবেন তা আমরা জানি না, আমরা চৌদ্দ দলের শরিক দল নই। তিনি কি ঘোষণা দেন? কীভাবে কর্মসূচির কথা বলেন সেটা আগে দেখার বিষয়। পরে আমরা আমাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করবো।

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
সাবেক রাষ্ট্রপতি ও চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টি

এখনো বিশেষ আগ্রহী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকায় 'নির্বাচনী মহাজোট' গড়ার বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত রেখেছে।

নির্বাচনী জোট-মহাজোটের বাইরে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আদৌ নির্বাচন হবে কি না, হলে কোন পরিস্থিতিতে এবং কীভাবে হবে। চৌদ্দ দলের তরফ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবেন না বলে ঘোষণা করছেন। এ ঘোষণাই ২২ নবেম্বরের মহাসমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আসতে পারে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার ঘনিষ্ঠজনদের বলেছেন বিএনপি-জামায়াত জোটকে আইনি বৈধতা দেয়ার জন্য তিনি নির্বাচন করবেন না। চৌদ্দ দলের জাসদ এ ব্যাপারে বেশ দৃঢ় এবং ঐ সমাবেশ থেকে একটা দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করার পক্ষপাতী। সেই ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় নেয়ার পরপরই সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিএনপির অভিমত যে, তারা সংবিধান অনুযায়ী চলবেন। '৯৬-এর নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তাদের ওপর ছিল। সুতরাং তার দায়দায়িত্ব তাদের ওপর পড়েছিল। কিন্তু এবার সেটা হবে না। তাছাড়া এরশাদের জাতীয় পার্টিও নির্বাচনে অংশ নেবে। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা নির্বাচনে অংশ না নিলে কোনো প্রকার সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন দেখা দেবে না। বরং আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও বামদের অভিমত জোট যে নির্বাচনী ফাঁদ পেতেছে তাতে পা দিলে সমূহ সর্বনাশ। এবার বৈধতা পেলে স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের দখল পুরোপুরিই নিয়ে নেবে। সুতরাং আন্দোলনের মাঠে পরাজিত করেই নির্বাচনে যেতে হবে।

সার্ক সম্মেলন আয়োজন করে খালেদা জিয়া আলোচিত যতটা হয়েছেন তার চেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছেন। নিয়ন্ত্রণহীন ঊর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্য খালেদা জিয়ার জন্যে অভিশাপ হিসেবে কাজ করছে। মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলের জন্যে তার সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। এতোগুলো নেতিবাচক দিক থাকার পরও ভোটের রাজনীতিতে খালেদা জিয়া যে খুব খারাপ অবস্থায় আছেন সেটা বলা যাবে না। কারণ চারদলীয় জোটের মূল শক্তি বিএনপি এবং জামায়াত যে এক সঙ্গে নির্বাচন করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাড়তি হিসেবে এরশাদকেও তারা পাশে পেতে পারে। সুতরাং ভোটের রাজনীতিতে একটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন খালেদা জিয়া।

আর শেখ হাসিনা কথাসর্বস্ব নেত্রী হিসেবে দিন দিন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। ভোটের রাজনীতিতে তার জোটে যারা আছেন তাদের কারো অবস্থাই ভালো নয়। ভোট না থাকলেও বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রের বাম দলগুলো সমস্যা তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। এদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে মধ্যপন্থী ভোট শেখ হাসিনা তার দিকে টানতে পারবেন কি না সেটা নিয়ে একটা সন্দেহ থেকেই যায়।

আগামী সময়টা খালেদা-হাসিনা নিজ নিজ স্বার্থে রাজনীতির মাঠ গরম রাখবেন। দেশ এবং জাতিকে নিয়ে রাজনীতি করবেন। নির্বিকার জনগণ দর্শক হয়ে সেটা দেখবেন।

বিরোধী দল তাদের রুটিনমাফিক কাজ করছে। সমাবেশ ঘিরে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, মহাসমাবেশে আওয়ামী লীগ ১০ লাখ লোক আনলে আমরা ২৫ লাখ আনবো। এর মাধ্যমে বোঝা যায় জনগণের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ বিএনপি মহাসচিবের ভাষায় তাদের কথায় লোক আসবে না, লোকজন আনতে হবে। এতে বোঝা যায়, তাদের অবস্থা কতো করুণ। ১৪ দলের মহাসমাবেশে সরকারের পতন হবে না। তাদের আগামী বছর অক্টোবর মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তখনই শুরু হবে আসল খেলা।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু
চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি (জেপি)

আমরা বিএনপি-জামায়াত জোটের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছি। এ জোটের ষড়যন্ত্রের নির্বাচনী ছক ২২ নবেম্বরের সমাবেশের মাধ্যমে ধূলিসাৎ করা হবে। প্রহসনের নির্বাচন বাংলার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে দেয়া হবে না। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে অর্থবহ পরিবর্তনের আন্দোলন করছি। সমাবেশ থেকে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া হবে। এবারের ঐক্য হচ্ছে নির্বাচনের ঐক্য, আন্দোলনের ঐক্য, দেশ পরিচালনার ঐক্য।

হাসানুল হক ইনু
সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)

১৪ দল আহূত ২২ নবেম্বরের কর্মসূচির বিস্তারিত এখনো আমরা জানি না। দলীয়ভাবে আমরা এখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। তবে এ সমাবেশ অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং সময়ের দাবিও বটে। এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য যে সমাবেশ হতে যাচ্ছে তাতে আমাদের নীতিগতভাবে সমর্থন আছে। আমরা চাই এ গণবিরোধী সরকারের পতন ঘটিয়ে জনগণের সরকার গঠন করা হোক।

মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান
মহাসচিব, বিকল্পধারা বাংলাদেশ

আমরা ১৪ দলের সঙ্গে নেই। এটা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি। প্রত্যেক বিরোধী দলের আলাদা কর্মসূচি দেয়ার অধিকার আছে। মহাসমাবেশের সঙ্গে আমাদের কোনো সমর্থন নেই। কোনো অর্থবহ পরিবর্তন আসে কি না সময় হলে দেখতে পাবেন।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

সাম্প্রদায়িক উগ্র জঙ্গিবাদ, রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ খালেদা-নিজামী জোট সরকারের দুঃশাসনের অবসান এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে অবাধ অর্থবহ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ সমাবেশ এক নতুন মাত্রা সংযোজন করবে। যা রাজনৈতিক টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে।

রায় রমেশ চন্দ্র
স্কপ নেতা ও সাধারণ সম্পাদক জাতীয় শ্রমিক লীগ

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : **খোন্দকার তাজউদ্দিন**